এই নয়টি দ্বীপের মধ্যে চারটি গঙ্গার পূর্ব পারে অবস্থিত ছিল এবং অন্য পাঁচটি গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত ছিল।

গঙ্গার পূর্ব পারের চারটি দ্বীপ ও তার অন্তর্গত গ্রামগুলি হল—

(১) অন্তর্দ্বীপ—মায়াপুর, ভারুইডাঙ্গা এর অন্তর্ভুক্ত। কথিত আছে, এখানে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়।

(২) সীমন্ত দ্বীপ—সরগঙ্গা ও সিমলা এর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ—গাদিগাছা, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) মধ্যদ্বীপ—মাজীদা ও ভালুকা এর অন্তর্ভুক্ত।

আর গঙ্গার পশ্চিমপারের পাঁচটি দ্বীপ ও গ্রামগুলি হল—

(৫) কোলদ্বীপ—কুলিয়া তেঘরির দক্ষিণ ও সমুদ্রগড় এর অন্তর্গত।

(৬) ঋতুদ্বীপ—রাতপুর, রাহুতপুর ও বিদ্যানগর এর অন্তর্ভুক্ত।

(৭) মোদক্রম দ্বীপ—মাউগাছি, মামগাছি ও মহৎপুর এর অন্তর্ভুক্ত।

(৮) জহ্নুদ্বীপ—জাননগর বা জানুনগর।

(৯) রুদ্রদ্বীপ—রাজপুর বা রুদ্রডাঙ্গা, সঙ্কাপুর ও পূর্বস্থলী এলাকা এর অন্তর্গত।

এর থেকে অনুমান করা যায়, তখন নবদ্বীপের পরিধি বা সীমা বহু বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল।

আবার কেউ কেউ 'নবদ্বীপ' নামের অর্থ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা মনে করেন, নবদ্বীপ বলতে নব বা নতুন দ্বীপ বোঝায়। তাঁদের মতে, এই এলাকাটি গঙ্গার মধ্যবর্তী একটি চরভূমি ছিল। কালক্রমে গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হয় ও ঐ চরভূমি আস্তে আস্তে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে ঐ অঞ্চল মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠলে সেখানে জনসমাগম হয়। তারপর তা ক্ষুদ্র পল্লী থেকে বঙ্গের রাজধানী হয়।

আবার কারও কারও মতে, পুরাকালে প্রদীপকে দীয়া বলত এবং 'ন' অর্থাৎ নয়টি—এ থেকেই নাকি ন-দীয়া বা নব-দ্বীপ নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই মতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের মতে, গঙ্গামধ্যবর্তী চরে যখন মনুষ্যবসতি শুরু হয় তখন ওই চরে একজন সন্ন্যাসী প্রতিদিন রাতে নয়টি দ্বীপ জ্বালিয়ে তান্ত্রিক সাধনা করত। দূর থেকে লোকে ওই নয়টি দ্বীপ দেখিয়ে ন-দীয়া বলতে শুরু করে। ক্রমে ওই চরের নাম নদীয়া নামে খ্যাতি লাভ করে।

নদীয়া নামের উৎপত্তি নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও, একথা স্পষ্ট নবদ্বীপ ও নদীয়া একই স্থানের নাম। প্রাচীন কালের কিছু রচনা থেকে জানা যায় নদীয়া গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলাসহ নদীয়া, বর্ধমান ও হুগলি জেলার কিছু অংশ গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার কালিদাসের 'রঘুবংশ', ষষ্ঠ শতকে রচিত 'বৃহৎসংহিতা', পাল-সেন আমলের নথি-লেখ-তথ্য প্রভৃতি থেকে অনুমান করা যায়, বর্তমান নদীয়া জেলা চিরকাল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রাচীন কালে তা কিছু সময় বঙ্গের অন্তর্ভুক্তও ছিল। অর্থাৎ সব সময়েই নদীয়া বঙ্গ বা গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

পাল রাজাদের আমলের আগে প্রায় ১৫০ বছর বঙ্গের ইতিহাস পরিষ্কার ভাবে জানা যায় না। যেটুকু জানা যায়, তা ধোঁয়াশাময়। গুপ্তযুগে রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে

বাংলাদেশ বঙ্গ ও গৌড় নামে দুটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। তখন পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের একাংশ নিয়ে 'বঙ্গ' রাজ্য গড়ে উঠেছিল। আর পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'গৌড়' রাজ্য।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষভাগে, ষষ্ঠ শতকের প্রায় শেষ দিকে শশাঙ্ক নামে এক শক্তিশালী রাজা গৌড়ে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। এই কর্ণসুবর্ণ নদীয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। পাল আমল থেকে অর্থাৎ অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলাদেশের ইতিহাস পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে অরাজকতা, ম্যাৎসন্যায় অবস্থার অবসানের জন্য তখনকার বাংলার নেতৃস্থানীয় মানুষ, গোপালকে রাজা হিসাবে মনোনীত করেন ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজত্বকালে গোপাল দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল সুষ্ঠভাবে দেশ পরিচালনা করেছিলেন। গোপাল ও ধর্মপালের আমলে নবদ্বীপ বা নদীয়া তাঁদের শাসনাধীনে ছিল। নদীয়া বা নবদ্বীপ তখন গৌড়ের অধীনে ছিল। পাল রাজারা গৌড় দখল করলে নবদ্বীপ বা নদীয়ায় তাঁদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকের ধারণা, পাল রাজারা নবদ্বীপে একটি বাসস্থান তৈরি করেছিলেন। নবদ্বীপ থেকে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত 'সুবর্ণ-বিহার' গ্রামের নাম থেকে তাঁরা এই অনুমান করেন। 'বিহার' শব্দের অর্থ 'মঠ'। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে ঐ গ্রামের নাম নাকি 'সুবর্ণ-বিহার' রেখেছিলেন। তাই ওই গ্রামের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা হয় তা পাল রাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

পাল-রাজবংশের পর বাংলায় সেন রাজবংশ রাজত্ব করে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক (কর্ণাট) অঞ্চলে তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল। সামন্ত সেন, হেমন্ত সেনের পর বিজয় সেন বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর রাজত্বকাল আনুমানিক ১০৯৬ থেকে ১১৫৮ খ্রিস্টাব্দ। বিজয় সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯) সিংহাসনে বসেন। বল্লাল সেন গৌড় ছাড়াও নবদ্বীপ ও সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। সেই সময় ভাগীরথী নদী নবদ্বীপের পশ্চিম দিকে প্রবাহিতা ছিল। অনুমান করা হয়, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভাগীরথী নদী গতি পরিবর্তন করে। বল্লাল সেন তাঁর রাজত্বকালে নবদ্বীপে ভাগীরথীর তীরে এক প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন এবং জীবনের বহু সময় সেখানে জীবন অতিবাহিত করেন। মায়াপুরের অদূরে বামুনপুকুর গ্রামে আবিষ্কৃত 'বল্লাল ঢিবি' তাঁরই প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলে দাবি করা হয়। তাঁর শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে তিনি হিন্দুসমাজকে নতুন ভাবে গড়ার উদ্দেশ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেন।

বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫ খ্রিস্টাব্দ) ক্ষমতাসীন হন। লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপেই তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন স্থায়ীভাবে এখানে রাজধানী স্থাপন করলে পুণ্যস্থান নবদ্বীপে রাজকর্মচারী, সভাসদেরা স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে। ক্রমে জনবিরল নবদ্বীপ জনবহুল নগরে পরিণত হয়। বৈষ্ণব ধর্মানুরাগী লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর প্রমুখ গুণী ব্যক্তি অলঙ্কৃত করেছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই (আনুমানিক ১২০২ খ্রিস্টাব্দে) ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী নদীয়া আক্রমণ করলে লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপ থেকে পালিয়ে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন। মিনহাজউদ্দিন লিখিত ফারসি গ্রন্থ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' থেকে এই আক্রমণের কথা জানা যায়। কেবলমাত্র ১২ জন অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার নবদ্বীপে প্রবেশ করে প্রাসাদের দ্বাররক্ষীদের হত্যা করে নবদ্বীপ দখল করেন। বখ্‌তিয়ার কয়েকদিন মাত্র এখানে অবস্থান করে লুণ্ঠন-পীড়ন-অত্যাচার-হত্যা করে গৌড়ের দিকে যাত্রা করেন।

বখতিয়ার খলজীর নদিয়া অভিযানের পরই বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের সূচনা হয়। এই সময় বাংলাদেশে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করে মাঝে মাঝেই বাংলার শাসকরা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকেন। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বঙ্গদেশ তাঁর দখলে নেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সিকন্দর শাহ, গিয়াসুদ্দিন আজম, সইফউদ্দিন হাম্‌জা ক্রমে বাংলাদেশের সিংহাসনে বসেন। সইফ-উদ্দিন হাম্‌জার শাসনকালে গণেশ বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গণেশের পর তাঁর পুত্র যদু বা জালালউদ্দিন সিংহাসনে বসেন। যদুর পুত্র সামসুদ্দিন ভৃত্যদের দ্বারা নিহত হলে ইলিয়াসশাহী বংশের নাসিরউদ্দিন বাংলার সিংহাসনে আসীন হন। তারপর রুকনউদ্দিন বারবাক্ শাহ, মজাফর শাহ ক্রমে সিংহাসনে বসেন।

পঞ্চদশ শতকের শেষে অত্যাচারী মজাফর শাহ নদীয়াবাসীর উপর অত্যাচার শুরু করলে তাঁরই প্রধানমন্ত্রী হুসেন শাহ ১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান ও হিন্দু জমিদারদের সহায়তায় সিংহাসন অধিকার করেন। চৈতন্যের জীবনকালে তিনি সুলতান ছিলেন। চৈতন্যের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর আমলে অনেক হিন্দু রাজ দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। তাঁর রাজসভায় রূপ গোস্বামী 'দবরীখাস' ও সনাতন গোস্বামী 'সাকরমল্লিক' হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। কিছু কাজি তখন বিভিন্ন জায়গায় নদীয়া শাসন করতেন। চাঁদ খাঁ নামে একজন কাজি তখন নবদ্বীপের কাছে বামনপুকুরে থাকতেন; মুলুক নামে একজন কাজি শান্তিপুরের কাছে গঙ্গাতীরে বসবাস করতেন।

হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ সিংহাসনে আসীন হন। তিনিও তাঁর পিতার মতো সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পরবর্তীকালের সুলতানরা অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। সেই সুযোগে শেরশাহ গৌড় অধিকার করেন এবং হুমায়ুনকে পরাজিত করে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সম্রাট হন। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েকজন গৌড়ের শাসনকর্তা হন। আবার ১৫৫৬ সালে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর জয় লাভ করে সেনাপতি মুনিম খাঁ ও টোডরমল্লকে বাংলায় পাঠান। এখানে এসে মুনিম খাঁ মহামারিতে মারা গেলে আকবর টোডরমল্লকে সাহায্য করতে হুসেনকুলি খাঁকে পাঠান ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে। মোগলবাহিনীর আক্রমণে বঙ্গদেশ থেকে পাঠানরা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। বঙ্গদেশ তখন মোগলদের শাসনাধীনে আসে। টোডরমল্ল হয়েছিলেন মোগল সম্রাটের বাংলার প্রতিনিধি।

মোগল সম্রাট আকবরের শেষ জীবনে প্রতাপাদিত্য নামে একজন শক্তিশালী

ভূস্বামী নদীয়ার পশ্চিমাংশ দখল করেন। পরবর্তীকালে তাকে দমন করতে ইসলাম খাঁর নেতৃত্বে রাজকীয় বাহিনী পাঠানো হয়। তাঁর হাতে প্রতাপাদিত্যের পতন হয়। অন্যদিকে জাহাঙ্গীর তাঁর সেনাপতি মানসিংহকেও বাংলায় পাঠিয়ে ছিলেন প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে। সেই সময় মানসিংহকে বাংলায় অনেকে সাহায্য করেছিলেন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে দিল্লীর দিকে যাত্রাকালে পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। সেই সময় মানসিংহ নদীয়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। সেই কারণে রামচন্দ্র সমাদ্দারের প্রথম পুত্র ভবানন্দ মজুমদার জাহাঙ্গীরের কৃপা লাভ করেন। ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে ভবানন্দ জাহাঙ্গীর প্রদত্ত ১৪ পরগণার সনদ (ফরমান) সূত্রে নদীয়া রাজ হয়েছিলেন এবং নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভবানন্দের পরবর্তী বংশধররা রায় উপাধি ব্যবহার করেন। ভবানন্দ বাগোয়ান থেকে তাঁর রাজধানী মাটিয়ারীতে স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে নদীয়ারাজ রুদ্র রায় মাটিয়ারী থেকে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং তার নাম রাখেন শ্রীকৃষ্ণের নামানুসারে কৃষ্ণনগর।

নদীয়ারাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ও খ্যাতিমান রাজা ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮২)। তাঁর রাজত্বকালে (১৮২৮-১৭৮২ খ্রিস্টাব্দ) জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের দ্বারা তাঁর রাজসভা অলংকৃত হয়েছিল। ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, গোপাল ভাঁড় প্রমুখের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তাই কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে 'বাংলার বিক্রমাদিত্য' বলা হয়। তাঁর সময়ে বঙ্গ-সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল কৃষ্ণনগর তথা নদীয়া। কিন্তু সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁকে অনেকে 'নেমকহারাম' নামে অভিহিত করেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধ সংঘটিত হলে কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজদের পক্ষ নিয়েছিলেন। তারই পুরস্কার স্বরূপ লর্ড ক্লাইভ কৃষ্ণচন্দ্রকে 'রাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যায়। ইংরেজ শাসনে অন্যান্য সব জায়গার মতো নদীয়াতেও প্রভূত পরিবর্তন হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের পর 'নদীয়া-বিভাগ' গঠন করা হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ বাদে পরবর্তী প্রেসিডেন্সি বিভাগের সমস্ত অঞ্চলই তার অন্তর্গত ছিল। 'নদীয়া-বিভাগে'র প্রধান কার্যালয় হয় কৃষ্ণনগর। কিন্তু পরে আবার প্রধান কার্যালয় আলিপুরে স্থানান্তরিত হয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনেও নদীয়ার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এখানেই ঘটেছিল নীলবিদ্রোহের ঘটনা। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দিগম্বর বিশ্বাস ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস। শহিদ বসন্ত বিশ্বাস, শহিদ বাঘাযতীন, শহিদ অনন্তহরি মিত্র নদীয়ার সন্তান হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনও হয় নদীয়ার বুকে। অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী এই সব আন্দোলনে যোগদান করে কারাবাস ও নির্যাতন ভোগ করেন।

শেষে ১৯৪৭ সালে এল খণ্ডিত স্বাধীনতা। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে নদীয়াও বিভক্ত হয়। নদীয়ার উত্তরাংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দক্ষিণাংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইংরেজ

শাসনাধীনে একসময় নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল যশোহর। তারপর আবার সীমানা পরিবর্তিত হয়ে যশোহর আলাদা হয়ে যায় এবং ফরিদপুর, কুষ্টিয়াকে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারপর স্বাধীনতা লাভের পর আবার নদীয়া খণ্ডিত হয়। ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা এলেও নদীয়া তখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়নি; তিন দিনের জন্য পাকিস্তানভুক্ত ছিল। তারপর ১৮ই আগস্ট তারিখে নদীয়া ভারতভুক্ত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় নদীয়া জেলার সীমানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে।

প্রাচীনকালে নদীয়া—জ্ঞান, শাস্ত্র ও বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। সে সময়ে নদীয়া বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে উজ্জ্বল স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। গঙ্গীতীরবর্তী নদীয়ার বিদ্যাচর্চা তখন নদীর মতোই দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছিল। প্রায় ২৫০০ বছর পূর্বেও নদীয়া শিক্ষা ও বিদ্যাচর্চায় সমৃদ্ধ ছিল। সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস 'মহাবংশ' থেকে একথা জানা যায়। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তখন নবদ্বীপ ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র।

কেরী ও মার্শম্যানের ইতিহাস থেকে জানা যায়। নবদ্বীপের রাজা আদিশূরের সময় তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চায় প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এই সময় রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় কবি ভট্টনারায়ণ লিখেছিলেন 'বেণীসংহার' নাট্যকাব্য। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশে দেখা দেয় দারুণ দুর্যোগ। মাৎসন্যায় শাসন চলতে থাকে। সেই সময় বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সাময়িক ছেদ লক্ষ্য করা যায়।

তারপর দেশের নেতৃবর্গ দেশের মঙ্গল চিন্তা করে গোপালকে বাংলার সিংহাসনে বসালে (৭৫০ খ্রিঃ) দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। পালরাজাদের আমলে আবার নদীয়ার হৃত গৌরব ফিরে আসে। বিদ্যাচর্চায় আবার উন্নতি হতে থাকে। কৃষ্ণনগর থেকে কিছু দূরে তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সুবর্ণবিহার। সেখানে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চলতে থাকে বৌদ্ধচর্চা।

পালরাজাদের আমলের পর সেন রাজাদের আমলেও বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। সেই সময় নবদ্বীপের পণ্ডিতদের সাহায্যে বল্লাল সেন লিখেছিলেন 'অদ্ভুত সাগর' ও দানসাগর'। লক্ষ্মণ সেনের শাসনকালে নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চায় শীর্ষে উঠেছিল। তাঁর রাজসভা জয়দেব, উমাপতিধর, গোবর্ধন আচার্য, শরণ, ধোয়ী—এই পঞ্চরত্নে আলোকিত হয়ে ওঠে। শুধু রাজসভা নয়, সমগ্র নবদ্বীপেই তখন বিদ্যাচর্চার গৌরব বৃদ্ধি পায়। কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-স্মৃতি-জ্যোতিষ ও বেদবেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রচর্চার জন্য নবদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয়েছিল। এই সময়েই জ্যোতিষিরা পঞ্জিকা গণনা করেন। তখন দেশ-বিদেশ থেকে বিদ্যার্থীরা বিদ্যাচর্চার জন্য নবদ্বীপে আসত।

তারপরই হঠাৎ নবদ্বীপের বুকে নেমে আসে অন্ধকার। তুর্কী আক্রমণে ভীতসন্ত্রস্ত, হতচকিত হয়ে পড়ে সমগ্র নদীয়াবাসী। লুণ্ঠন, অত্যাচার চলতে থাকে। দেশের এই অরাজকতার জন্য বিদ্যাচর্চার অফুরন্ত ক্ষতি হয়; নষ্ট হয়ে যায় বহু পুঁথিপত্র। ধর্মান্তরিত হয় বহু মানুষ। নতুন শতাব্দীতে মানুষের মনে শান্তি বিরাজ করে। কৃত্তিবাস ওঝা সপ্তকাণ্ড বাংলা রামায়ণ রচনা করেন। সেই সময় নবদ্বীপের সিংহাসনে বসেন হুসেন শাহ। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আবার নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চায় প্রভূত উন্নতি হতে থাকে।

এমন সময় আবির্ভাব হয় শ্রীচৈতন্যের। সমগ্র নদীয়াবাসী তাঁর বাহুপাশে ধরা দেয়। জ্ঞান নয়, ভক্তি; ঘৃণা নয়, প্রেম এই নতুন ধর্মাদর্শে সমস্ত মানুষকে কাছে টেনে নেন, ঐক্যবদ্ধ করেন। সমগ্র নদীয়া হয়ে উঠেছিল বৈষ্ণব তীর্থস্থান। জীবনী সাহিত্য লেখা শুরু হয়। নবদ্বীপ তখন বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রভূমি, সংস্কৃত ও সংস্কৃতিচর্চার সুবর্ণ যুগ—বাংলার অক্সফোর্ড। ন্যায়াচার্য বাসুদেব সার্বভৌম, নব্য-ন্যায়ের প্রবক্তা রঘুনাথ, স্মার্ত রঘুনাথ, তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। দূর-দূরান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা জ্ঞানার্জনের জন্য সে সময়ে নবদ্বীপে উপস্থিত হত। বারাণসী, মিথিলার মতো নবদ্বীপের চুতষ্পাঠী ও টোলগুলি ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েও (১৭১০-১৭৮২ খ্রিঃ) তাঁর রাজসভায় কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, সাধককবি রামপ্রসাদ সেনের মতো জ্ঞানী-বিদ্বান পণ্ডিতেরা সভাসদরূপে আসন অলঙ্কৃত করতেন। তাঁর সময়ে বঙ্গ সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল কৃষ্ণনগর তথা নদীয়া।

ইংরেজ শাসনকালে সমগ্র ভারতবর্ষের মতো নদীয়াতেও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারীরা মূলত খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য এবং এদেশীয় মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ক্রমে প্রশাসনিক স্বার্থেই ইংরেজরা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করে। মিশনারীদের পাশাপাশি নদীয়ার কিছু প্রগতিশীল মানুষ ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সচেষ্ট হন।

নদীয়ার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায় নদীয়া তথা নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারা বহন করে এসেছে। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা লোপ পেতে শুরু করে। কিন্তু বঙ্গদেশে পাল রাজত্বে বৌদ্ধধর্ম আরও অনেক বছর স্থায়ী হয়। পরবর্তীকালে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে তুর্কি সেনাপতি ইফ্‌তিকার বক্তিয়ার খিলজির নেতৃত্বে বঙ্গদেশে তুর্কি আক্রমণের মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনের সূচনা হয়।

আবার এই নদীয়াতেই ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে সিরাজদৌল্লার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য অস্তগামী হয়। সিরাজদৌল্লার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন, অপশাসন, ভুল রণনীতি, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা, বিত্তশালীদের ষড়যন্ত্র—যে কারণেই হোক না কেন নদীয়া জেলায় ইংরেজ আমলের সূত্রপাত ঘটে।

একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অত্যাচার, অন্যদিকে ইসলামধর্মের আগ্রাসী মনোভাবের মধ্যে পড়ে সমাজের মধ্য ও নিম্নস্তরের মানুষের করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলমান শাসকরা হিন্দুসমাজকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করত; তাদের ধর্মান্তরিত করতে পারলে যে একটা মহৎ কর্তব্য পালন হল বলে তারা মনে করতেন। হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করা, মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করা মুসলমান শাসকদের নিত্যকর্মে পরিণত হয়েছিল। 'চৈতন্য ভাগবত' থেকে জানা যায়, হুসেন শাহের সেনাপতি উড়িষ্যা আক্রমণ করে সেখানকার অনেক মন্দির অপবিত্র করেছিলেন এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচার করেছিলেন। হুসেন শাহের অনেক হিন্দু রাজকর্মচারী ছিল। তাঁর প্রধান রাজকর্মচারী সনাতন (সাকর মল্লিক) উড়িষ্যা অভিযানে

না যাওয়ার জন্য তাঁকে কিছুকাল বন্দী করে রাখা হয়। 'কালাপাহাড়' হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর বহু মন্দির ও দেব মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন। হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন। সে সময়ে অনেকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস' (২য়) থেকে জানা যায়, সে সময়ে গৌড় নগরের মুসলমানরা হিন্দুদের ধর্মাচরণে বাধা দিত। সেই জন্য সনাতন গোস্বামী ও অন্যান্য হিন্দুরা রাজধানী গৌড় নগর ছেড়ে রামকেলি গ্রামে বসবাস শুরু করেছিল। কামরূপ অভিযানে গিয়ে হুসেন শাহের সৈন্যরা কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির ধ্বংস করেছিল। মুসলমান শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্তক্ষেপে মুসলমান ধর্মান্তরীকরণ প্রবলভাবে চলেছিল সে সময়ে। চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থগুলি থেকে জানা যায়, সে সময়ে হিন্দুদের উপর মুসলমানরা নির্যাতন করত। এই রকম সামাজিক প্রেক্ষিতেই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলামধর্মের অত্যাচার থেকে আদ্বিজ চণ্ডাল নির্বিশেষে জনসাধারণকে উদ্ধারের জন্য তাঁর আবির্ভাব হয়। চৈতন্যাবির্ভাব হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর আবির্ভাব না ঘটলে বহু নিম্নবর্গীয় হিন্দু হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত। তাঁর আবির্ভাবের ফলে বাংলায় সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরও সূচনা হয়। চৈতন্য আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রভূমি ছিল। সেখানে ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতির চর্চা হতো। কিন্তু মুসলমান শাসনকালে হিন্দুসমাজে ভক্তিভাব হ্রাস পেয়েছিল, বৃথা পাণ্ডিত্যের দম্ভ প্রধান হয়ে উঠেছিল। তন্ত্রমতাবলম্বী কুলাচারী হিন্দু ও সহজিয়া বৌদ্ধরা তখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। একজন বাঙালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 'নেড়া' নাম গ্রহণ করে বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াত। বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি ঘটলেও তখন গোপনে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, নাথধর্ম, কৌলধর্ম, তন্ত্রাচার প্রভৃতি রহস্যময় 'কায়সাধন' অনুষ্ঠিত হতো। তান্ত্রিকসাধনা তখন জনসমাজের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। নেপাল থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত অঞ্চলে তান্ত্রিক পরিমণ্ডল 'বিষ্ণুক্রান্তা' নামে প্রচলিত ছিল। সে সময়ে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নামে একজন বিখ্যাত তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বৃহৎতন্ত্রসার'-এ তান্ত্রিক ধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানা যায়। সে সময়ে জনসাধারণ মনসা, চণ্ডী, ধর্ম প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর পূজা করত, যক্ষের উপাসনা করত, চণ্ডীবিষহরির দোহাই দিয়ে মদ-মাংস ভক্ষণ করত। সুকুমার সেনের মতে, মনসা, চণ্ডী ও লক্ষ্মী এক সময়ে এক দেবী ছিলেন। পরবর্তীকালে পুরোহিতদের মধ্যে গণ্ডগোলের জন্য তারা আলাদ হয়ে যায়। ধর্মের আসল পরিচয় নিয়েও বিতর্ক আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, ধর্ম আসলে লোকস্তরে বুদ্ধাবতার। ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ধর্ম হল বরুণ। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, ধর্মের উপাসনা ছিল আদিম সূর্যোপসনা। ডোমজাতির পণ্ডিতরাই সে সময়ে ধর্মপূজায় পৌরোহিত্য করতেন। কিন্তু চণ্ডী-পূজার পুরোহিতরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। এসব লোকধর্মের কোনও বিরোধিতা করা হয়নি ব্রাহ্মণ্য উপাসনায়। কারণ, বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল লোকধর্ম। পঞ্চদশ শতকে একেবারে নিম্নস্তরে যাদুবিশ্বাসভিত্তিক গ্রাম্য দেবতার পূজা প্রচলিত ছিল হিন্দুসমাজে। স্মার্ত পণ্ডিতরা এই সব অবৈদিক 'কাল্ট'কে ব্রতানুষ্ঠানে, হিন্দুধর্মের মধ্যে স্থান দিয়েছিল।

এই রকম সামাজিক প্রেক্ষিতেই বাংলার লোকধর্মগুলির উদ্ভব হয়। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন,

> "ষোড়শ শতাব্দী শেষ হইবার আগেই বৈষ্ণব ধর্ম অবৈষ্ণব গুহ্য সাধকদের অর্থাৎ যোগী-তান্ত্রিক সুফীদের আকর্ষণ করিতে শুরু করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দে এখন কোন কোন সাধক সম্প্রদায় বাহ্যত বৈষ্ণব বৈরাগীর আচার ও আচরণ অবলম্বন করিলেন। প্রধানত ইহাদের মধ্য দিয়াই চৈতন্যের ক্রমবর্ধমান আচার-বিচার ও সেবা পূজা ইত্যাদি বিধিভুক্ত পদ্ধতির বহিরঙ্গতা এড়াইয়া দেশের অন্তর্ভূমিতে নামিয়া গিয়া সর্বত্র প্লাবিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে লাগিল। প্রধানত এই অনুরাগমার্গী সমাজ বহির্ভূত সাধকদের মধ্যেই চৈতন্যের মনোধর্মের সজীব বীজটুকু প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছিল।"

তাঁর এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় কেন অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ লোকধর্মের সৃষ্টি করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের এক দ্রাবিড় ভক্ত তোতারাম নবদ্বীপে এসেছিলেন ন্যায়শাস্ত্র পড়তে। সাধন-ভজনায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি হঠাৎ বৃন্দাবনে চলে যান। তারপর আবার নবদ্বীপে ফিরে এলে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে বসবাসের জন্য জমি দান করেন। 'বড় আখড়া' তৈরি করে তিনি সেখানে সাধন-ভজনা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সাধন-ভজনা নানাভাবে ব্যাহত হতে থাকে। কারণ তখন সমাজে বৈষ্ণব উপ-সম্প্রদায়গুলি প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই হতাশ ও ক্রুদ্ধ তোতারাম ঘোষণা করেন—

> "আউল বাউল কর্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই।
> সহজিয়া সখীভাবকী স্মার্ত জাত গোঁসাই।।
> অতি বড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী।
> তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ নাহি কর।।"

বোঝা যায়, সে সময়ে তেরোটি গৌণ ধর্মসম্প্রদায় সমাজে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার মধ্যে আবার উল্লেখ আছে গৌড় নাগরী ও জাত গোঁসাইয়ের কথা।

চৈতন্যের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে নরহরি ও তাঁর ভাইপো রঘুনন্দন বর্ধমানের কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ডে গৌড়নাগরবাদ প্রচার করেছিলেন। গৌড়নাগরবাদে শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে শ্রীচৈতন্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার নবদ্বীপকে ঐশী ভূমিরূপে বৃন্দাবনের উপরে স্থাপন করা হয়। নরহরির এই মতবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে ছিলেন জগদানন্দ পণ্ডিত, কালী মিত্র, রঘুনন্দন, লোচন দাস, পুরুষোত্তম, বালু ঘোষ, কৃষ্ণদাস, গদাধর পণ্ডিত, গদাধর দাস প্রমুখ। কিন্তু অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। চৈতন্যদেবের পূজার জন্য নরহরি 'শ্রীভক্তি চন্দ্রিকা পটল' নামে একটি বিধি সন্দর্ভ লিখেছিলেন। নরহরি বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী তত্ত্ব-দর্শনকে খুব একটা গুরুত্ব দেন নি। নরহরি চৈতন্যকে নদীয়া-নাগররূপে কল্পনা করে ভক্তকে তাঁর প্রেমমুগ্ধ নাগরী ভেবেছেন। এই হল গৌড়নাগরবাদের মূল কথা।

এই মতবাদকে তোতারাম অস্পৃশ্য মনে করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় অষ্টাদশ

শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্মের অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল। মৌলবাদী বৈষ্ণবদের অনুদারতা ও সংকীর্ণতা লোকধর্মের উদ্ভবের কারণ বলে মনে করা যেতে পারে। চৈতন্য পরবর্তীকালে বৈষ্ণবরা জাত বৈষ্ণবদের আঘাত করেছিল। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে যাঁরা পূর্ব সমাজ ত্যাগ করে ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছিলেন তাঁরাই হল জাত বৈষ্ণব। সমস্ত জাতির মানুষ এর মধ্যে থাকলেও শূদ্ররাই বেশি ছিল। চৈতন্য এই সব মানুষকে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য বৈষ্ণবধর্মের আঙিনায় তাদের স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তী কালে তারা বৈষ্ণব সমাজে ব্রাত্য হয়ে গেল। অজিত দাস তাঁর 'জাত বৈষ্ণব কথা' গ্রন্থে লিখেছেন—

> "জাত বৈষ্ণব সমাজ বিপন্ন। বৈষ্ণব আন্দোলন প্রচারকদের প্রচারে মুগ্ধ হয়ে তারা নিগ্রহের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ, সামাজিক ও মানবিক মান-মর্যাদা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নিজ সমাজ ও জাত গোত্র বর্ণ ছেড়ে বৈষ্ণব পরিচয় মাত্র সার করে নিজেদের ধন্য মনে করেছিল।"

কিন্তু ধীরে ধীরে তারা দেখল পরবর্তীকালের বৈষ্ণবরা তাদের পাশ থেকে পলাতক। নিজেরা একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়ে তুলে নিজ সমাজে বৈষ্ণব গুরুরূপে পূজা নিতে থাকে। বৈষ্ণবদের কাছ থেকে সম্মান না পেয়ে তাদের করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়—না পারে পূর্বসমাজে ফিরে যেতে, না পায় বৈষ্ণব সমাজে গুরুত্ব। বর্ণাশ্রয়ী হিন্দুদের চোখে ওরা হরিজন বৈষ্ণব। এ সম্পর্কে অজিত দাস নানা কারণ দেখিয়েছেন—

১. ওরা ব্রাহ্মণের কাছে অস্পৃশ্য।
২. এরা ব্রাহ্মণের আচার পালন করে না।
৩. ওদের মালা চন্দনে বিয়ে সারা হয়।
৪. ওরা বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলনে অভ্যস্ত।
৫. অবৈধ বা জারজ সন্তানে ওদের সমাজ ভর্তি।
৬. ওদের অধিকাংশই ভিখিরি।
৭. অধিকাংশ নিম্নবর্গ থেকে আগত। তাই ওরা আর অগ্রসর হতে পারল না।

বর্ণাশ্রয়ী হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি বৃত্তিহীন বর্ণে পরিণত হয়ে গেল। এই অভিমানী জাত-বৈষ্ণবরা পরবর্তীকালে লোকধর্মের উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

তোতারাম তেরোটি গৌণধর্ম সম্প্রদায়ের কথা বললেও ক্রমে তার সংখ্যা বেশি হয়। সারা বাংলায় প্রায় ৩৯টি গৌণধর্ম বা লোকধর্মের উদ্ভব হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই লোকধর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানা না গেলেও অনুমান করা যায় তাদের অধিকাংশই যৌনাচারে উৎসাহী ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয় বৌদ্ধতান্ত্রিক কিছু দেহযোগ, কিছুটা নাথধর্মের ধারা ও সুফীধর্মের মত। সে সময় হিন্দু-মুসলমান ভাবসমন্বয়ের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এরই ফলে বাংলায় কয়েকটি শক্তিশালী লোকধর্মের উদ্ভব হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর এই লোকধর্মগুলির মধ্যে বেশিরভাগ আজ হারিয়ে গিয়েছে। তার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম ও খৃষ্টধর্মের প্রসার এর জন্য দায়ী। এই সব ধর্মের প্রতিরোধে লোকধর্মগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই জন্য উনিশ শতকের মধ্যে বেশির ভাগ লোকধর্ম সম্প্রদায়গুলি হারিয়ে যায়।

নদীয়া জেলার লোকধর্মগুলি সম্পর্কে জানার আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর নদীয়া জেলায় ধর্মীয় বাতাবরণটি পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে। কুমুদনাথ মল্লিক তাঁর 'নদীয়া কাহিনী' গ্রন্থে বলেছেন, "নদীয়ার হিন্দু অধিবাসিগণ নানা মূলধর্ম্মে ও শাখাধর্ম্মে' বিভক্ত, যথা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব এবং কর্তাভজা, বলরামভজা ইত্যাদি। এতন্মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং কর্ত্তাভজা, বলরামভজা সম্প্রদায় প্রভৃতি কতিপয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তিস্থান এই নদীয়া জেলা। এখানে শাক্ত বা শৈব অপেক্ষা বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক। ব্রাহ্মণগণ প্রায়শঃ শাক্ত অথবা শৈব। এক সময়ে নদীয়ায় এই দুই ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল কিন্তু বর্তমানকালে ক্রিয়ান্বিত তান্ত্রিক বা শৈব দুর্লভ।" ('নদীয়া কাহিনী', কুমুদনাথ মল্লিক)

তাঁর মতে, সাধারণ হিন্দু গৃহস্থরা স্মার্ত রঘুনন্দনের মতানুযায়ী কাজ করে থাকেন। ভেকধারী ও খাঁটি বৈষ্ণব মতানুসারী ব্যক্তি ছাড়া নদীয়ার সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক মতভেদ থেকে দূরে সরে থাকতেন। আর্থিক অনটনের কারণে অনেকে ইচ্ছা থাকলেও ক্রিয়াকর্ম, ব্রত, পার্বণাদি করতে পারতেন না। তখনকার বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

> "এই গৌড় মণ্ডলে রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধ্বাচার্য ও নিম্বাদিত্য এই চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণবের মধ্যে একমাত্র মাধ্বাচারী সম্প্রদায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ দেব মাধ্বাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং বর্তমান কালে যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম এতদঞ্চলে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা শ্রীচৈতন্যদেবেরই মতানুসারী। এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।
>
> ১ম,—যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন, শ্রীগৌরাঙ্গের কোন মতামত গ্রাহ্য করেন না।
>
> ২য়,—যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ নিরুক্তমতে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন।
>
> ৩য়,—যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবকেই উপাস্য জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন।
>
> ৪র্থ,—যাঁহারা নামে বৈষ্ণব হইলেও আচার ব্যবহারে একেবারে ভিন্ন পথাবলম্বী।"

প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণবের সংখ্যা সে সময়ে নদীয়ায় নগণ্য ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যা ছিল প্রায় সমপরিমাণ। চতুর্থ শ্রেণীর বৈষ্ণবের সংখ্যাই ছিল সবচেয়ে বেশি।

চৈতন্যদেব নিজে কোনও পুস্তক লিখে বৈষ্ণবধর্মের পথ নির্দেশ করে দেননি। তিনি তাঁর শিষ্য-ভক্তদের যে সব উপদেশ দিতেন পার্শ্বদ-ভক্ত বৈষ্ণবরা তা লিখে রাখতেন। এগুলি থেকেই এই ধর্মাচরণ সম্পর্কে তাঁর আদেশ ও অভিপ্রায় বোঝা যায়। এগুলির মধ্যে আটটি শ্লোক বৈষ্ণবসমাজে শিক্ষাষ্টক বলে খ্যাত। এই শিক্ষাষ্টকই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের যথাসর্বস্ব। চৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, অষ্টাদশপুরাণ, ব্রহ্ম সংহিতা, উপনিষদ, শ্রুতি প্রভৃতি যথেষ্ট আদর করতেন। তিনি ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান ও সাকার বলে মনে করতেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং পূর্ণ ভগবান বলে স্বীকার

করতেন। সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার জন্য তিনি ভক্তকে উপদেশ দিতেন।

রামানন্দ রায় প্রণালীক্রমে যে ভিন্ন ভিন্ন সাধ্য নির্দেশ করেছেন তা চৈতন্যদেবের অনুমোদিত ছিল। জ্ঞানশূন্য ভক্তি, প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখাপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম, কান্তভাব—এগুলি সাধনার ক্রমোন্নত উপায়। কিন্তু রাধার প্রেম অর্থাৎ মহাভাব সমাধি তাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

চৈতন্য পরবর্তীকালে নবদ্বীপের বহু বৈষ্ণবের কাছে চৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার। তাই তারা চৈতন্যদেবকে উপাস্য জ্ঞানে পূজা করে থাকেন। বর্তমানে এই শ্রেণীর বৈষ্ণবের সংখ্যাই বেশি। শুধু চৈতন্যদেবকে তারা অবতার মনে করেননি, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্যকেও অবতার মনে করেছেন। তাদের মতে, নিত্যানন্দ আসলে বলরাম এবং অদ্বৈত আচার্য সাক্ষাৎ সদাশিব। এই মতাবলম্বী বৈষ্ণবদের কাছে ভক্তি ও প্রেমই সর্বস্ব। তাদের মতে জীবমাত্রে ওই প্রেমভক্তির অনুষ্ঠানের অধিকারী। তারা প্রেমের অন্তর্গত শান্ত, দাস্য, সখ্য, মাধুর্য্য ও বাৎসল্য এই পাঁচ প্রকার ভাবকে স্বীকার করেন। নামসংকীর্তন এই মতাবলম্বীদের প্রধান সাধন। তবে সকল সাধনাতেই তারা গুরুর প্রয়োজন স্বীকার করেন। তারা গৃহী বৈষ্ণবদের মন্ত্রদান করে, কখনও শিষ্যদের কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করে, আবার কখনও চৈতন্যমন্ত্রও দান করে। এই সকল বৈষ্ণবরা গৃহে বসবাস করে ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করেন। আবার যারা বৈরাগ্য অবলম্বনে জাতি, কুল, মান পরিত্যাগ করে এই ধর্ম অবলম্বন করতে চান তাদেরকে 'ভেক' নিতে হয়। তবে বর্তমানে এই ভেকাশ্রমী বৈষ্ণবরাও বিয়ে করতে পারে। বিয়ের সময় বর কন্যা কণ্ঠিবদল করে এবং স্বয়ং দক্ষিণা ও গোস্বামীর নিমিত্ত ন্যূনতম পাঁচসিকা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতির ভোগ ও মহোৎসব হয়ে থাকে। এদের সম্প্রদায়ে বিধবা বিবাহেরও প্রচলন আছে। তবে সেক্ষেত্রে স্ত্রী সিন্দূর পরতে পারেন না। অন্যদিকে গৃহী বৈষ্ণবসমাজে বিধবা বিবাহের রীতি নেই।

লোকধর্মের স্বরূপ :

লোকধর্ম সম্পর্কে মানুষের ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয়। উচ্চবর্ণের মানুষেরা এই ধর্মকে খুব একটা ভালো নজরে দেখে না। তাদের মতে, লোকধর্ম দেহসর্বস্ব, বিকৃতরুচি, অনাচারবাদী। সমাজের অবহেলিত, শোষিত লোকধর্মের মানুষেরা গ্রামের এক প্রান্তে আত্মরক্ষার কারণে আত্মগোপন করে থাকে। এরা সাধারণ লোকাচার মানে; কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রশ্নের ধোঁয়াশাময় উত্তর দেয়। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত পেশার মানুষকে এরা একত্রিত করে। চৈতন্য পূর্ববর্তী সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মানুষ ও শক্তিমান সমাজপতিদের অত্যাচারে অত্যাচারিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা সমাজে প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে উচ্চবর্ণের মানুষের প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র বা ধর্মের সম্পর্কে এদের অনীহা দেখা দেয়। এই সব শোষিত, অত্যাচারিত মানুষেরা প্রায় সকলেই ছিল অশিক্ষিত। তথাকথিত শাস্ত্র বা ধর্ম তাদের দিশা দেখাতে পারেনি; বরং তার দ্বারা তারা শোষিতই হয়েছে বেশি। শাস্ত্রের নামে পুরোহিত তন্ত্র, সাধনার চেয়ে মন্দির-মসজিদের গুরুত্ব, পুতুল পুজো তাদের মনকে স্পর্শ করতে পারেনি। শুধু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শোষণ নয়, মোল্লাতন্ত্রের গোঁড়ামি নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে

শাস্ত্র-বিদ্বেষী মনোভাবের সঞ্চার করে। চৈতন্যদেব এইসব মানুষের কাছে ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হন। চৈতন্যদেবের উদারতা মানবতাবাদের স্পর্শে এই সব দলিত, শোষিত মানুষেরা বাঁচার অর্থ খুঁজে পায়, জাতি-বর্ণ, ধর্মকে দূরে সরিয়ে এরা সংঘবদ্ধ হয়। তারা শাস্ত্রীয় আচার-আচরণে থেকে ভাব ও আবেগ দিয়ে সমস্ত কিছুকে অনুভব করার চেষ্টা করে। কিন্তু চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরে অদ্বৈত আচার্য ও নিত্যানন্দ বৈষ্ণব ধর্মের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু আস্তে আস্তে বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। বৈষ্ণব ধর্মের একটা অংশ বিকৃত যৌনাচারে মগ্ন হয়। এই সময় সুফী প্রচারকেরা নদীয়ায় আনাগোনা শুরু করেন। চৈতন্য পরবর্তীকালে কালক্রমে উদার বৈষ্ণব মতের সঙ্গে সুফী মতের মিশ্রণে গড়ে ওঠে লোকধর্ম। এরা নিজেদের মতো করে ধর্মাচরণ, গুরু নির্বাচন করেছে। অত্যন্ত গোপনে তারা তাদের সাধনা চালিয়ে গিয়েছে। মূর্তিপূজা, দেহ-সম্পর্কিত সবকিছুর সম্পর্কে মনকে নির্বিকার করা, জাতিভেদের প্রতিবাদ করে গুরু ও গুরুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা এই ধর্মের ভিত্তিমূল। তারা তাদের গানের মাধ্যমে এসব ব্যক্ত করতে চেয়েছে। সেইজন্য দেহতত্ত্বের গান লোকধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মন্দির-মসজিদ, বেদ-কোরান, মূর্তিপূজা, অপদেবতার বন্দনায় এদের অনীহা লক্ষ্য করা যায়। আসলে এক ধরনের প্রতিবাদ থেকেই লোকধর্মের উৎপত্তি। এই ধর্মে পরলোকের চেয়ে ইহলোক, আত্মার চেয়ে দেহ, মন্ত্রের চেয়ে গান, ঈশ্বরের চেয়ে গুরু বড়ো স্থান পায়।

উচ্চবর্ণের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা প্রবর্তকের নামে নানা অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করে। ধর্ম সাধনায় তারা মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছে। তবে কালক্রমে এই ধর্মে এসেছে নানা ব্যভিচার, বিকৃতি, ভুল ভাষ্য, শিষ্যদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের চেষ্টা।

নদীয়া জেলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এখানে কয়েকটি অত্যন্ত শক্তিশালী লোকধর্মের উদ্ভব ঘটে প্রায় দুশো বছর আগে। এর মধ্যে প্রধান লোকধর্মগুলি হল—

(১) সাহেবধনী প্রতিষ্ঠিত সাহেবধনী সম্প্রদায় বা দীনদয়ালের ঘর
(২) বলরাম হাড়ি প্রবর্তিত বলরামী গোষ্ঠী বা বলাহাড়ী সম্প্রদায়
(৩) খুশি বিশ্বাস প্রবর্তিত খুশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়
(৪) আউলেচাঁদ প্রতিষ্ঠিত কর্তাভজা সম্প্রদায়
(৫) লালন প্রবর্তিত লালন শাহী সম্প্রদায়
(৬) আউল সম্প্রদায়
(৭) বাউল সম্প্রদায়

সহায়ক গ্রন্থ

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, ৫ম খণ্ড—১ম আনন্দ সংস্করণ-১৯৯১, প্রথম খণ্ড (সেপ্টে : ১৯৯৭) ২য় খণ্ড (আশ্বিন-১৪০৫)।
২। বৃহৎবঙ্গ, দীনেশচন্দ্র সেন, দ্বিতীয় খণ্ড (মার্চ ১৯৯৯), ১ম (মার্চ ১৯৯৯)।
৩। বাঙালির ইতিহাস, নীহাররঞ্জন রায়, ৫ম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৮১২, দে'জ পাবলিশিং।
৪। বাংলাদেশের ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১ম খণ্ড (অক্ট : ১৯৮৮)

৫। নদীয়া কাহিনী, কুমুদনাথ মল্লিক, জানু : ১৯৯৮।
৬। লালন ফকির কবি ও কাব্য, সনৎকুমার মিত্র, কলকাতা-১৩৮৬।
৭। ব্রাত্য লোকায়ত লালন, সুধীর চক্রবর্তী, কলকাতা-১৯৯২।
৮। সতীমা'র মেলা ও কর্তাভজা ধর্মসম্প্রদায়, মনীন্দ্র নারায়ণ মজুমদার, ২০০০।
৯। ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, আষাঢ় ১৪০৬।
১০। বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, রমাকান্ত চক্রবর্তী, জানু : ১৯৯৬।

Prabir Pramanik, Department of Bengali, University of Kalyani, West Bengal

বাংলা বাইবেলের দুশো বছর (১৮০৯-২০০৯) : একটি সমীক্ষা

সুরঞ্জন মিদ্দে

বাঙালির কাছে বাইবেল

বাইবেলের দু'টি অংশ। প্রথমটি 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' ও দ্বিতীয় অংশটির নাম 'নিউ টেস্টামেন্ট'। ইহুদি জাতির মূল ধর্মগ্রন্থের নাম বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' যা খ্রিস্টানদেরও ধর্মগ্রন্থ। বস্তুত ওল্ড টেস্টামেন্টের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মের সূচনা কিন্তু বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট' কেবলমাত্র খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

'ওল্ড টেস্টামেন্ট' হিব্রু ভাষায় লেখা আর গ্রিক ভাষায় রচিত 'নিউ টেস্টামেন্ট'। যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার (১৫০০) বছর আগে নবী মোজেস লেখেন 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'। 'নিউ টেস্টামেন্ট' খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে যিশুর শিষ্যরা লেখেন। যিশু খ্রিস্ট্রের জন্মের প্রায় চারশো (৪০০) বছর পর বিশ্ববিখ্যাত মনীষী জেরোম, ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। তারপর আরও অনুবাদের পর ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে বাইবেলের ইংরাজি অনুবাদ 'কিং জেমস্ ভার্সেন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যায়। পৃথিবীর সব ভাষাতেই (প্রায় দু-হাজার ভাষা ও উপভাষা) বাইবেল অনুবাদ হয়েছে। পাশ্চাত্যের ধর্ম-সাধনা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রধান বাইবেলের দান।

ভারতীয় ভাষায় প্রথম বাইবেল এল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। আর বাংলায় প্রায় আরো একশো বছর পর। ১৭১৪ খ্রিস্টাব্দে তামিল ভাষায় প্রথম বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট' অনুবাদ করেন ডাচ্ মিশনারি বার্থলেমিউ গলবলগ্। খ্রিস্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্যাথলিক মিশনারিরা খ্রিস্টীয় প্রচার পুস্তিকা ও গ্রন্থ প্রকাশ করলেও বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করার কথা ভাবেন নি। প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করার কথা ভাবেন। উনিশ শতকের প্রথমেই বাংলা গদ্যে বাইবেল অনুবাদ করেন। এই প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিরা ছিলেন রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরী ও তার বন্ধুরা। মিশনারি কেরী শ্রীরামপুর মিশন (১৮০০) প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষা ছাড়া আরও অন্তত ৪০টি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ ও প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে বাংলা ভাষায় বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনের এটাই সর্বপ্রথম মুদ্রিত বাংলা গদ্যপুস্তক। আর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেল প্রকাশ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

মিদ্দে, সুরঞ্জন : বাংলা বাইবেলের দুশো বছর (১৮০৯-২০০৯) : একটি সমীক্ষা
International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 55-66